দৈনিক বাংলা
136
... 23 JUL 1991 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১

শিক্ষা-সন্ত্রাস-রাজনীতি

সালেহ চৌধুরী

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনের ব্যাপার নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সম্মেলনে বাস্তব ফল কিছু দেখা না গেলেও সকলেই অন্তত এটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট যে, সমস্যা এবং তার নিরসনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পেয়েছে। এর থেকে বাস্তব অগ্রগতিও ঘটতে পারে। অতএব, বলা যায়, আশার সলতে একটু হলেও উসকানো গেছে। আর কে-না জানে, চরম অবস্থায় আঁকড়ে ধরার মত আশাই হচ্ছে একমাত্র ভরসা।

জাতীয় সংসদেও অচিরেই বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হতে যাচ্ছে। বিরোধী দল এ আলোচনার জন্যে একটি পুরো দিন নির্ধারণের প্রস্তাব দিলে সংসদের উপনেতা, যিনি শিক্ষামন্ত্রীও বটে, প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে জানান, সরকারও এ আলো-চনায় আগ্রহী। আপাতত সংসদ অপর কয়েকটি গুরুতর বিষয় নিয়ে ব্যস্ত। অতএব, অচিরেই, একটুখানি ফুসরত তৈরী হলেই সংসদ এ বিষয়টির প্রতি মন দেবে। আমরা এতেও আশান্বিত বোধ করছি।

আদতে শিক্ষাঙ্গনে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে, সন্ত্রাস এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এ নিয়ে আলোচনায় নামতে ভূমিকা ফাঁদারও দরকার করে না। সকলেই সচেতন এবং সন্ত্রস্ত। সমস্যার নেহায়েত স্বীকৃতি তাই সমাধানের কিংবা সে পথে অগ্রগতির নির্ভরযোগ্য দ্যোতক নয়। বাস্তব এবং বাস্তবায়নযোগ্য সিদ্ধান্তই কেবল সে নির্ভরতা দিতে পারে। আলোচনার যে ক্ষীণ ধারাটির সূচনা ঘটেছে তা কত দ্রুত স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে তাই এখন লক্ষ্যণীয়।

স্থির সিদ্ধান্তকে নিশ্চিত ধরে নিয়ে সময়ের দিকটির উপর জোর দেয়া অর্থহীন নয়। এ সিদ্ধান্তে যে আমাদের পৌঁছতেই হবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রশ্ন কেবল সময় নিয়ে। কেননা আমরা সকলেই যখন সন্ত্রাসের নিন্দায় একমত তখনো এমন আলামত দেখা যায় যে, সন্ত্রাস বলতে আমি কেবল চোখের দেখাকেই বুঝাতে চাই, আমার আস্তিনের আড়ালে উদ্যত শানিত ছোরাকে এখনো যেনো হিসেবে আনতে নারাজ। এমন মনোভাবের অবসান না ঘটলে কাজের কাজ কিছু হওয়ার নয়। একথাটা সকলকেই বুঝতে এবং মানতেহবে।

রাজনৈতিক নেতৃত্বকে, তার অবস্থান সরকার কিংবা বিরোধী পক্ষ যেখানেই হোক, এ সত্যটিকে মেনে নিতে হবে। সন্ত্রাসের অস্তিত্ব সকল অবস্থাতেই রাজনৈতিক প্রশ্রয় নির্ভর। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বিস্তারের ধারা অনুসরণ করলেও দেখা যাবে বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক পৃষ্ঠ-পোষকতা লাভ করার ফলেই এই বিষ বৃক্ষের শিকড় এমন গভীরে পৌঁছতে পেরেছে। আজ যদি তার উৎপাটনই কাম্য হয় (এ লক্ষ্য নিয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়) তবে সুস্থির এবং অকপট রাজ-নৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই তা করতে হবে। যাকে এক কথায় বলতে পারি জাতীয় ঐকমত্য।

সন্ত্রাস শিক্ষা জীবনকে অনিশ্চিত করে তুলেছে। কখন বা কদিন ক্লাস চলবে না চলবে তার সবই নির্ভর করে সন্ত্রাসের মাত্রার উপর। জীবনের নিশ্চয়তাও হরণ করেছে। একের পর এক শিক্ষার্থী জীবন হারাচ্ছেন। এই মুহূর্তে যে তরুণ দৃপ্ত পদভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পথ পরিক্রমণরত যেকোন মুহূর্তেই তাকে সন্ত্রাসের শিকার হয়ে মর্গে আশ্রয় নিতে হতে পারে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এসবই সন্ত্রাসের কিংবা সন্ত্রাস প্রশ্রয় পাওয়ার পরিণাম। তিন বছরের শিক্ষাসূচী সাত বছরে শেষ হয় না, এ-ও যেমন সন্ত্রাসের জের, তেমনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষা মর্যাদা এবং নির্ভরযোগ্যতা হারাচ্ছে সেও তেমনি এই সন্ত্রাসের ফল বলেই কথিত। সোজা কথায় সন্ত্রাস এক-দিকে শত সমস্যা তৈরী করছে, অন্যদিকে শত সমস্যাকে আড়াল করে রাখছে। ওদের দিকে নজর দেয়া যাচ্ছে না বলে সেসব সমস্যার প্রভাব আরো মারাত্মক হয়ে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ একটাই সকলে মিলে সন্ত্রাস বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়া এবং তা কার্যকর করা।

প্রধানমন্ত্রী এ নিয়ে যে আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন, জাতীয় সংসদ যে আলোচনার অবতারণা করতে যাচ্ছেন এবং সমাজের সকল স্তরে আলোচনা-আহাজারি চলছে সব মিলিয়ে যদি কাম্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়ও (হতেই যে হবে এতে সন্দেহের অবকাশ রাখারও উপায় নাই) তাতেই কি সব ঝামেলা চুকে যাবে? এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দেয়া মুশকিল। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস একদিনে জাঁকিয়ে বসেনি। এক কথায় তাকে উড়িয়ে দেয়ারও তাই উপায় নেই। একমত হয়ে কাজে নামলেও সন্ত্রাসের অবলম্বনগুলো উপড়ে তুলতে সময়ের প্রয়োজন হবে। এক অস্ত্র উদ্ধারের জন্যেই প্রয়োজন হবে বিপুল পরিশ্রমের।

সে শ্রমের মাত্রা আর জটিলতা বোঝানোর জন্যে এটুকু উল্লেখই যথেষ্ট যে, সন্ত্রাস দেশের প্রচলিত আইনেই কঠোর দণ্ডযোগ্য অপরাধ। আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তাই কোনো বিশেষ আয়োজন ছাড়াই সন্ত্রাস দমনের যে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেন। শিক্ষাঙ্গন এমনিতে আইনের আওতা বহির্ভূত কোনো এলাকা নয়। তা সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে তেমন উদ্যোগী নন বা উদ্যোগী হতে পারেন না। না পারার একটি কারণ অবশ্যই এই সন্ত্রাসের সঙ্গে রাজ-নীতির ঘনিষ্ঠ সংযোগ। তবে মূল কারণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ নাজুক অবস্থান। কিছু করতে গেলে কিছু ঘটেও যেতে পারে। আর এটাই হচ্ছে আশংকার হেতু। বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের হাতে কিছু ঘটে গেলে তা বড় রকমের রাজনৈতিক জটিলতা পাকিয়ে তুলতে পারে। এমন একটা অবস্থাকে সবাই ভয় করেন। আর, সে ভয় অমূলকও নয়। তবে প্রশ্ন হচ্ছে ভয় করে করে আর কতকাল হাতগুটিয়ে বসে থেকে আমরা আমাদের সন্তানদের সর্বনাশের পথ প্রশস্ততর করে চলতে পারি? ভয়টা যদি সত্য হয়, ভয় কাটানোর প্রয়োজনটা আরো বড় সত্য।

এই ভয় কাটানোর জন্যেই প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যমত্য। সকলে একমত হয়ে কাজে নামলে ভয় করার কারণ অনেকটাই কমে যাবে এজন্যে যে, উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে (যদি সত্যি তেমন কিছু ঘটেও যায়) রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে নামার সুযোগ কারো থাকবে না। কেননা যা কিছু ঘটবে তার দায় -দায়িত্বে সক-লেরই ভাগ থাকবে। তাছাড়া, সর্ব-সম্মত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ত্রাসের জোয়ারে বড় ধরনের ভাটা দেখা দিতে বাধ্য। রাজনৈতিক প্রশ্রয়ের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বল্পসংখ্যক পাকা মাস্তান ছাড়া অন্য সকলে যে নতুন পথে পা বাড়াবে, এটা স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধরে নেয়াযায়।

সুদৃঢ় জাতীয় সিদ্ধান্তের পরও যে স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তি অস্ত্র আর সন্ত্রাস আঁকড়ে থাকবে বা থাকতে চাইবে কার্যত তারা ছাত্র পরিচয়ের সীমা ছাড়ানো বিভ্রান্ত তরুণ। ওদের পথে আনার জন্যে অনেক কিছুই ভাবা সম্ভব। আর ব্যর্থতার মুখে কঠোর ব্যবস্থা নিলেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার আশংকা থাকবে না এ জন্যে যে, এদের অনাচার কেবল শিক্ষাঙ্গনকেই নয়, সমাজজীবনকেও অতিষ্ঠ করে তুলেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, ওরা কারও সহানুভূতির অধিকার রাখে না।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রশ্নে রাজ-নৈতিক সিদ্ধান্তটা তাই খুবই জরুরী। দলীয় নেতাদের সভায়, জাতীয় সংসদে এবং অভিভাবক সমাজসহ বিভিন্ন মঞ্চেই বিষয়টি আলোচিত হতে পারে। এই সব আলোচনার ফলাফল খোলামেলা প্রকাশ পাওয়া উচিত। কেননা এরই মাধ্যমে জনমত সুসংহত হয়ে লক্ষ্য অর্জনের অনুকূল শক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে। সমস্যা-টি আজ আর কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমায় আবদ্ধ নয়, গোটা জাতিকে উদ্ব্যস্ত করে তুলতে চলেছে। এর সমাধানেও তাই জাতীয় উদ্যোগ এত জরুরী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎ-কারে এ বিষয়টির উপর জোর দিয়েছেন যে, সবাইকে পরিষ্কার করে বলতে হবে 'সন্ত্রাসীরা আমার বা আমাদের কেউ নয়'। এই বলা টুকু যে অনেকখানি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বলতে পারা যে কঠিনও বটে তা-ও অনস্বীকার্য। এই সন্ত্রাসের সঙ্গে রাজনীতির যোগ এমন গভীর যে, জাতীয় রাজনীতি তো বটেই, বিশ্ব-বিদ্যালয়, রাজনীতির কুশিলবদের পক্ষেও হুট করে সন্ত্রাসীদের 'আমার কেউ নয়' বলে দূরে ঠেলে দেয়া কঠিন।

শিক্ষা আর সুন্দর জীবনের স্বপ্ন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আগত তরুণ সাধ করে সর্বনাশের পথে পা বাড়ায় এমন হতে পারে না। যেসব সামাজিক কারণ আমাদের সন্তানদের এই আত্ম-নাশের পথে ঠেলে দেয় তার বহুলাংশেই রাজনীতিজাত। আমাদের নেতৃবৃন্দ যদি এ সত্য মেনে নিয়ে খোলামনে এগিয়ে আসতে পারেন, সমাধানের পথ নির্ণয় কঠিন হওয়ার কারণ থাকবে না। আর সন্ত্রাস এবং অস্ত্রমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলেই দেখা যাবে কি বিপুল সমস্যার জঞ্জাল সেখানে জমে আছে। সমস্যার সে পাহাড় হটানোর কাজও খুব যে সহজ হবে এমন মনে করার কারণ নেই। তবে ভরসা এই যে, প্রধান আড়াল সরে যাওয়ায় সমস্যার স্বরূপ চিনে নেয়া যেমন সহজ হবে, তেমনি সমাধানের পথে এগুনোও হবে তুলনায় সহজ আর স্বচ্ছন্দ।

রাজনৈতিক নেতারা একবার বৈঠকে বসেছেন। দরকার হয় আবার বসুন। জাতীয় সংসদ দিনব্যাপী পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় বসতে যাচ্ছেন, প্রয়োজন বোধে একাধিক দিন এতে অতি-বাহিত হোক। সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের জন্যে এর কিছুই অপচয় গণ্য হবে না। কেননা এরই উপর নির্ভর করছে গোটা জাতির ভবিষ্যৎ। তারুণ্য শক্তির অপচয় রোধ করার কাজে ব্যয়িত শক্তি-সামর্থ্য শেষ বিবেচনায় সেরা বিনিয়োগ বলেই গণ্য হবে।